পিপলিয়া কালানের উল্কা ও সৌরমণ্ডলের জন্ম

বিমান নাথ

একটি মৃত্যুর মধ্যেই কি থাকে আর এক জীবনের বীজ? আমাদের পৃথিবীসহ গোটা সৌরজগতের বেখাপ্পা রকমে দ্রুত গড়ে ওঠার পিছনে কি ছিল কাছাকাছি অপর এক নক্ষত্রের জীবনশেষের প্রলয়: সুপারনোভা বিস্ফোরণ? রাজস্থান থেকে পাওয়া একটি উল্কাপিণ্ড ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য।

ক্র্যাব নীহারিকা: সুপারনোভা বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট এই ধুলো ও গ্যাসের মেঘ পরবর্তী প্রজন্মের নক্ষত্র গড়ার উপাদান

রাজস্থানের পশ্চিম প্রান্তে একটা ছোট গ্রাম পিপলিয়া কালান। জেলা: পালি। গ্রামটার নাম পালি জেলার বাইরে কেউ জানে কিনা সন্দেহ। অথচ বিজ্ঞানীমহলে এটা এখন একটা সুপরিচিত নাম। এবং তার কারণ কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধের কোনও মারাত্মক ঘটনা নয়, যেসব উপকরণ ছাড়া আজকাল কোনও খবর হয় না বললেই চলে। পিপলিয়া কালানের খ্যাতির মূলে রয়েছে একটা সাধারণ উল্কা।

সাল ১৯৯৬। তারিখ ২০ জুন। রাত প্রায় সাড়ে আটটা। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় গ্রামের বেশিরভাগ লোকজনই ঘরের বাইরে ছিলেন। তাই ঘটনাটা তাঁদের নজর এড়ায়নি। রাতের আকাশ চিরে একটা উজ্জ্বল উল্কা গ্রামের পাশে একটা অনাবাদি জমিতে এসে পড়েছিল।

উল্কাদের জগতে পিপলিয়া কালানের উল্কা খুবই সাদামাটা এবং হালকা। তার ওজন ৫০ কিলোগ্রামও নয়। যে ধরনের উল্কাপিণ্ড ডাইনোসরদের বংশনাশ করেছিল বলে সবাই মনে করেন, তার মতো ভারী তো নয়ই, সাইবেরিয়ার টুংগুসকার বিখ্যাত উল্কার মতো ছোটখাটো বিস্ফোরণ ঘটানোও এর সাধ্যের মধ্যে ছিল না।

কিন্তু তার মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল, যা অনেক বিজ্ঞানীর কাছে সোনার চেয়েও দামি। সেই দ্রব্যটি খুঁজতে এবং সেটা নিয়ে গবেষণায় কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানী অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। গত দশ বছরে এই উল্কা নিয়ে গবেষণা করে তাঁরা এমন কিছু তথ্য পেয়েছেন, যার ফলে সৌরমণ্ডলের জন্ম সম্বন্ধে এতদিনকার ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

পিপলিয়া কালানের উল্কার মধ্যে এমন কী অসাধারণ জিনিস ছিল, সেটা জানতে হলে সৌরমণ্ডলের গোড়ার কথায় চলে যেতে হয়!

বিজ্ঞানীরা যদিও সূর্যের এবং গোটা সৌরমণ্ডলের জন্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিয়ে এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি, তবে কয়েকটা ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁরা মোটামুটি একমত। তাঁদের মতে, প্রায় ৪৫৬ কোটি বছর আগে সূর্য এবং সৌরজগতের জন্ম হয়েছিল একটা বায়বীয়, গ্যাস-ভর্তি নীহারিকা বা 'নেবুলা' থেকে। মহাকাশে এমন গ্যাসীয় মেঘ প্রচুর দেখা যায়। বিভিন্ন কারণে এইসব মেঘ একসময় আয়তনে ছোট হতে শুরু করে, কখনও হয়তো নিজের মহাকর্ষের দৌলতে, আবার কখনও বাইরে থেকে কোনও আঘাত বা চাপের পাল্লায় পড়ে। তখন মেঘটা সংকুচিত হয়ে তার একেবারে কেন্দ্রের ঘনীভূত অংশ থেকে একটা বা কয়েকটা নক্ষত্র জন্ম নেয়—যেমন আমাদের ক্ষেত্রে সূর্য। তারপর যা বাকি পড়ে থাকে তার থেকে প্রথমে ছোটখাটো কঠিন পদার্থ এবং তারপর ধীরে ধীরে গ্রহ, গ্রহাণু বা ধূমকেতু এসব বস্তুপিণ্ড তৈরি হয় (এই প্রক্রিয়ার কয়েকটি ধাপ দেখান হয়েছে ডানদিকের ছবিতে)। জন্ম নেয় একটা গ্রহমণ্ডল। এই হল বিজ্ঞানীদের ধারণা।

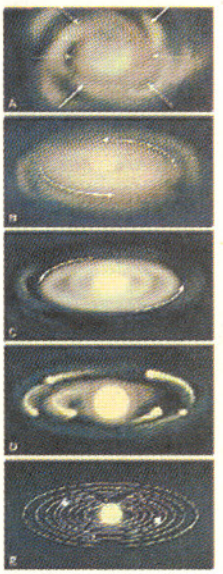

বিজ্ঞানীরা যদিও এই ধারণার মূল আদলটা নিয়ে মোটামুটি একমত, কিন্তু এর মধ্যে অনেক প্রশ্ন রয়ে যায়। যেমন, প্রশ্ন ওঠে, কত সময় লেগেছিল এই পুরো ঘটনাটা ঘটতে? যদি মহাকাশের কোনও গ্যাসীয় মেঘকে নিজের থেকে সংকুচিত হতে দেওয়া হয়, তাহলে তার থেকে একটা নক্ষত্র তৈরি হতে কত সময় লাগার কথা, সেই অঙ্কটা খুব সহজ না হলেও কষে ফেলা যায়। ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্র্যাঙ্ক শু প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে এর জন্য চাই প্রায় এক কোটি বছর, কমপক্ষে অন্তত ৫০ লক্ষ বছর। তারপর এর চারিদিকের পদার্থ থেকে ধীরে ধীরে তৈরি হবে ছোটখাটো পদার্থপিণ্ড। এইসব বস্তু থেকে বড়সড় গ্রহাণু এবং গ্রহ তৈরির জন্য আরও দশ কোটি বছর দরকার।

পিপলিয়া কালানের খ্যাতির মূলে আছে একটা সাধারণ উল্কাপিণ্ড, কিন্তু তার মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল, যা অনেক বিজ্ঞানীর কাছে সোনার চেয়েও দামি।

এর অর্থ হল অন্তত কয়েক কোটি বছর সময় চাই কোনও গ্রহমণ্ডলের জন্মের জন্য। এর চেয়ে কম সময়ে মেঘের সংকোচন সম্ভব নয়। মহাকর্ষ তার নিজের নিয়মে চলে, এর চেয়ে তাড়াহুড়ো করে নক্ষত্র তৈরি তার পক্ষে অসম্ভব।

প্রশ্ন হল, আমাদের সৌরজগতের জন্মের বেলায় কি মোটামুটি এতখানি সময় লেগেছিল? নাকি এর চেয়ে বেশি বা কম সময় ধরে চলেছিল তার জন্মপ্রক্রিয়া? কিন্তু আমরা কী করে এবং কোথায় এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাব? কী করে জানতে পারব সৌরমণ্ডলের জন্ম নিতে কত সময় লেগেছিল? জন্মের সময় কখন কী হয়েছিল, সে বিবরণ জানিয়ে দেবে এমন ঘড়ি আছে কোথায়?

এর উত্তর আছে 'হ য ব র ল'—তে!

'হযবরল'র রুমালটা যেমন বেড়াল হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমন কিছু কিছু পরমাণু তাদের চেহারা পালটায়। একটা অ্যালুমিনিয়ামের পরমাণুর উদাহরণ নেওয়া যাক। অন্য অনেক পদার্থ ছেড়ে হঠাৎ আমরা কেন অ্যালুমিনিয়াম নিয়ে পড়লাম, তার একটা বিশেষ কারণ রয়েছে। অ্যালুমিনিয়াম এমন এক ধরনের জিনিস যাকে গলান এবং তারপর বাষ্পে পরিণত করার জন্য খুব উঁচু তাপমাত্রা চাই। এর তাৎপর্য হল এই: যদি খুব গরম পদার্থের কোনও মিশ্রণ নেওয়া হয় এবং তাকে ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে দেওয়া হয়, তাহলে তার মধ্যে যেসব জিনিস সবচেয়ে প্রথমে কঠিন হয়ে দানা বাঁধবে, তারা হবে অ্যালুমিনিয়ামের মতো পদার্থ। এই কথাটা হয়তো একটা উদাহরণের সাহায্যে সহজে বোঝা যেতে পারে। ধরা যাক, কোনও শহরে বন্যা হয়েছে। যখন জল ধীরে ধীরে বাড়বে তখন উঁচু বাড়িগুলো সবচেয়ে শেষে ডুববে। যেমন, অন্যান্য পদার্থদের মধ্যে বাষ্পীভূত হতে অ্যালুমিনিয়ামের প্রয়োজন খুব বেশি তাপমাত্রা। কিন্তু যখন জল জমে যাবে তখন সেই উঁচু বাড়িগুলোই সবচেয়ে আগে জলের তলা থেকে ভেসে উঠবে, ঠান্ডা হওয়ার সময় সবচেয়ে আগে অ্যালুমিনিয়ামের বাষ্প থেকে কঠিন হওয়ার মতো।

কী করে জানতে পারব সৌরমণ্ডলের জন্ম নিতে কত সময় লেগেছিল? জন্মের সময় কখন কী হয়েছিল, সে বিবরণ জানিয়ে দেবে এমন ঘড়ি আছে কোথায়? এর উত্তর আছে 'হ য ব র ল'—তে!

অর্থাৎ আদি সৌরমণ্ডলে যেসব পদার্থ প্রথমে কঠিন হয়ে দানা বেঁধেছিল, তাদের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম হল অন্যতম প্রধান। যাই হোক, সাধারণত অ্যালুমিনিয়ামের পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ১৩টা প্রোটন আর ১৪টা নিউট্রন। কিন্তু কোনও কোনও অ্যালুমিনিয়ামের পরমাণুর কেন্দ্রে একটু অনিয়ম ঘটে—তার মধ্যে থাকে ১৩টা প্রোটন ও ১৩টা নিউট্রন—মোট ২৬টা পদার্থকণা। সাধারণ অ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় এটা খানিকটা হালকা—আমরা একে তাই 'হালকা অ্যালুমিনিয়াম' বলব।

এই হালকা অ্যালুমিনিয়ামটাই হল 'হযবরল'র রুমাল। একে এমনই রেখে দিলে কিছুক্ষণ পরে হয়ে যায় একটা বেড়াল, অর্থাৎ অন্য একটা পরমাণু—এই ক্ষেত্রে খানিকটা ভারী ম্যাগনেসিয়াম। ধরা যাক কিছু পরিমাণ হালকা অ্যালুমিনিয়াম নেওয়া হল। প্রায় সাড়ে সাত বছর পরে দেখা যাবে এর অর্ধেকটা ভারী ম্যাগনেসিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। পরে এই ম্যাগনেসিয়ামের—যেটা আসলে 'ছিল রুমাল হয়ে গেল বেড়াল'—তার অস্তিত্ব থেকে পুরনো হালকা অ্যালুমিনিয়ামের কথা অনুমান করা যেতে পারে।

এই কথা মাথায় রেখে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পিপলিয়া কালানের উল্কার টুকরো নিয়ে সূক্ষ্ম পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। তাঁরা খুঁজতে চেষ্টা করলেন, এর মধ্যে সেই বেখাপ্পা ধরনের ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া যায় কিনা। ভারতের মাত্র একটা পরীক্ষাগারেই এত সূক্ষ্ম পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে—এবং সেটা পৃথিবীর অন্য যে-কোনও পরীক্ষাগারকে টেক্কা দিতে পারে।

আমদাবাদ শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে রয়েছে এইসব পরীক্ষার যন্ত্রপাতি। প্রায় ৫০ বছর আগে বিক্রম সারাভাইয়ের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল এই গবেষণা সংস্থা। তারপর এখানে দেবেন্দ্র লালের মতো বিজ্ঞানীরা সৌর জগতের নানা বিষয় নিয়ে গবেষণার একটা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। বর্তমানে যেসব বিজ্ঞানী সৌরজগতের জন্ম নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন জিতেন্দ্র গোস্বামী এবং নরেন্দ্র ভাণ্ডারী। শ্রীগোস্বামী বর্তমানে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধিকর্তার কাজও সামলাচ্ছেন।

তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে অসমের যোরহাটে। পরে মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউটে গবেষণা করার সময়ে চাঁদ থেকে কুড়িয়ে আনা পাথরের টুকরোকে পরীক্ষা করার সুযোগ পান। তারপর থেকে সৌরজগতের নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা চাঁদে মহাকাশযান পাঠানোর যে পরিকল্পনা করেছে, তাতে এই গবেষণাগারের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে।

যাই হোক, কুড়িয়ে পাওয়ার বছর খানেকের মধ্যেই ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পিপলিয়া কালানের উল্কাপিণ্ডে একটা চমকপ্রদ জিনিস আবিষ্কার করেন। তাঁরা এর মধ্যে যত পরিমাণ বেখাপ্পা, ভারী ম্যাগনেসিয়াম খুঁজে পেয়েছিলেন, তার থেকে অনুমান করলেন শুরুতে কত পরিমাণ হালকা অ্যালুমিনিয়াম ছিল তাতে। 'শুরুতে' মানে উল্কাপিণ্ডটি তৈরি হওয়ার সময়। যতটা বেড়াল পাওয়া গেল তার থেকে তাঁরা অনুমান করলেন প্রথমে কতগুলো রুমাল আটকা পড়েছিল। তার সঙ্গে সাধারণ অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ তুলনা করে দেখলেন যে, শুরুতে হালকা অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ সাধারণ অ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় প্রায় ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ ছিল।

তাঁরা জানতেন যে, সৌরজগতের একেবারে প্রাচীন কঠিন পদার্থের মধ্যে এই অনুপাত এর চেয়ে অনেক বেশি ছিল। যেমন ১৯৬৯ সালের মেক্সিকোয় ছিটকে পড়া 'আইয়েন্দে' (Allende) উল্কাপিণ্ডটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তার বয়স অনেক বেশি। সেই উল্কাপিণ্ডটা সৌরজগতের আদ্যিকালে জন্ম নিয়েছিল এবং সেখানে এই হালকা এবং সাধারণ অ্যালুমিনিয়ামের অনুপাত ছিল পিপলিয়া কালানের অনুপাতের চেয়ে একশো গুণ বেশি। অর্থাৎ পিপলিয়া কালান উল্কাপিণ্ডের জন্ম হয়েছে কিছুটা পরে—ততদিনে কিছু পরিমাণ হালকা অ্যালুমিনিয়াম রূপ পালটেছে, এবং সাধারণ অ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় তার পরিমাণ গিয়েছে কমে। তাঁদের পরীক্ষা প্রমাণ করল যে, পিপলিয়া কালানের উল্কার জন্ম হয়েছিল সূর্যের জন্মের প্রায় ৫০ লক্ষ বছরের মধ্যে।

কিন্তু আমদাবাদের বিজ্ঞানীরা ততদিনে পিপলিয়া কালানের উল্কাপিণ্ড সম্বন্ধে আর একটা তথ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। উল্কাটা পরীক্ষা করে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এটা আসলে একটা বড় গ্রহাণু 'ভেস্টা'র ভাঙা টুকরো। গ্রহাণুদের জগতে ভেস্টা বেশ বড়—আয়তনে গ্রহাণুদের মধ্যে দ্বিতীয় (ব্যাস প্রায় ৫০০ কিলোমিটার, তবে যেহেতু বৃহত্তম গ্রহাণু 'সেরেস' বর্তমানে বামন-গ্রহের পর্যায়ে পদোন্নতি পেয়েছে, এখন ভেস্টাই হবে বৃহত্তম গ্রহাণু)। এবং গ্রহাণুদের মধ্যে উজ্জ্বলতম হল ভেস্টা। তাই এর পাথরের উপাদান ইত্যাদির বিশদ খবর আছে বিজ্ঞানীদের কাছে এবং তা হুবহু মিলে গেল পিপলিয়া কালানের উল্কার উপাদানের সঙ্গে।

এইবার সকলের খটকা লাগল। গ্রহাণুর মতো বিশাল বস্তুপিণ্ড

কিন্তু আমদাবাদের বিজ্ঞানীরা ততদিনে পিপলিয়া কালানের উল্কাপিণ্ড সম্বন্ধে আর একটা তথ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। উল্কাটা পরীক্ষা করে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এটা আসলে একটা বড় গ্রহাণু 'ভেস্টা'র ভাঙা টুকরো। এইবার সকলের খটকা লাগল। তাহলে কি তাত্ত্বিকদের এতদিনের ধারণা ভুল?

অতীতের এক প্রকাণ্ড উল্কার সংঘর্ষে জন্ম নিয়েছিল মহারাষ্ট্রের এই লোনার হ্রদ। তুলনায় পিপলিয়া কালানের উল্কাপিণ্ডটি খুবই সাদামাটা এবং হালকা। তার ওজন ৫০ কিলোগ্রামও নয়। যে ধরনের উল্কা ডাইনোসরদের বংশনাশ করেছিল বলে সবাই মনে করেন তার সঙ্গে এর তুলনাও চলে না।

তৈরির জন্য তো ৫০ লক্ষ বছরের চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগার কথা! তাত্ত্বিকদের মতে এর জন্য অন্তত কয়েক কোটি বছর প্রয়োজন। তাহলে কি তাত্ত্বিকদের এতদিনের ধারণা ভুল?

শুধু তাই নয়, প্রাচীন উল্কাপিণ্ডের মধ্যে এমন একটা বেখাপ্পা ধরনের তেজস্ক্রিয় পরমাণুর অস্তিত্ব আরও কিছু প্রশ্ন তোলে, কারণ এসব পরমাণু হল ক্ষণজন্মা। এই হালকা অ্যালুমিনিয়ামের উৎপত্তি যেখানেই হোক না কেন, তার 'আয়ু' হল মোটামুটি ৭০ লক্ষ বছর। এরপরেই সে চেহারা বদলে হয়ে যাবে সেই বেড়াল, অর্থাৎ ম্যাগনেসিয়াম। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, এই ধরনের পরমাণু উল্কাপিণ্ডটি তৈরি হবার খুব কম সময়ের মধ্যেই তার মধ্যে আস্তানা গেড়েছিল।

কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে শুধু দুই ধরনের পরিবেশেই হালকা অ্যালুমিনিয়ামের জন্ম হতে পারে। এক, যদি শিশু-সূর্য থেকে শক্তিশালী পদার্থকণা বেরিয়ে এসে তার চারিদিকের গ্যাসে আঘাত হানে, তাহলে কিছু পরিমাণ তেজস্ক্রিয় অ্যালুমিনিয়াম জন্ম নিতে পারে। অথবা দুই, কোনও নিকটবর্তী নক্ষত্রের মৃত্যুর সময় এক বিস্ফোরণে তৈরি হতে পারে এমন পরমাণু। অধ্যাপক গোস্বামী এবং তাঁর সহকর্মীরা তখন অঙ্ক কষে প্রমাণ করলেন যে, শক্তিশালী পদার্থকণার দ্বারা এই পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পরমাণু তৈরি করা অসম্ভব। এছাড়া ততদিনে বিজ্ঞানীদের কাছে শুধু হালকা অ্যালুমিনিয়াম নয়, কিছু প্রাচীন উল্কাপিণ্ডের মধ্যে একধরনের তেজস্ক্রিয় ক্যালসিয়ামের অস্তিত্বও ধরা পড়েছে। এবং এর সাহায্যে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা শক্তিশালী পদার্থকণার প্রকল্পও ভুল প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন।

তাহলে এই দাঁড়ায় যে, পিপলিয়া কালানের মতো উল্কাপিণ্ডে যে-প্রাচীন হালকা অ্যালুমিনিয়াম ছিল, সেটা তৈরি হয়েছিল কোনও নিকটবর্তী নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণে। এমনটা আগে কেউ কল্পনা করেনি। ভাবার কোনও প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা একটা বড় আঘাত হানল প্রচলিত চিন্তাধারার উপর। পিপলিয়া কালানের নাম তখন বিজ্ঞানীদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

অবশ্য আরও একটা কারণে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণার খবর বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। যখন হালকা অ্যালুমিনিয়াম রূপ পাল্টায়, তখন তার পরমাণু কেন্দ্র থেকে কিছু পদার্থকণা বেরিয়ে আসে—সেটাই হল রূপান্তরের আসল কারণ। এইসব ছিটকে পড়া পদার্থকণা থেকে তৈরি হয় খুব শক্তিশালী বিকিরণ, যার ফলে আশেপাশের পদার্থ গরম হয়ে ওঠে। তেজস্ক্রিয় পরমাণু তাই একধরনের শক্তির উৎস। সত্যি বলতে কী, পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থই তার অভ্যন্তরকে উত্তপ্ত করে রেখেছে। এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মতে, সৌরজগতের জন্মের অব্যবহিত পরে হালকা অ্যালুমিনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তার উত্তাপেই একসময় ভেস্টার মতো গ্রহাণুর ভেতরের অংশ গরম হয়েছিল। গত কয়েক বছরে পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহল এই ধারণাকে মেনে নিয়েছেন। এবং এই প্রসঙ্গেও পিপলিয়া কালানের নাম সুপরিচিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সবথেকে বেশি চমকপ্রদ ছিল সৌরজগতের জন্মের উপর একটা নিকটবর্তী বিস্ফোরণের প্রভাবের আবিষ্কার। বিজ্ঞানীমহলে এখন যে-প্রকল্পটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা হল এই—যে-মেঘ থেকে সূর্যের জন্ম হয়েছে, সেই মেঘে একটা নিকটবর্তী বিস্ফোরণের ভস্ম ছিটকে এসে পড়েছিল—যার ছিটেফোঁটা পরিমাণ ঢুকে পড়েছে প্রাচীন উল্কাপিণ্ডের ভেতর। আর এমনও হতে পারে যে, সেই আদি মেঘটা নিজের থেকে নয়, বরং এই বিস্ফোরণ থেকে ছিটকে পড়া পদার্থের চড়চাপড় খেয়ে সাত-তাড়াতাড়ি ছোট হতে লেগে গিয়েছিল। যার ফলে কয়েক কোটি নয়, কয়েক লক্ষ বছরেই সংকুচিত হয়েছিল সেই মেঘ। 'প্রসব'-এর সঠিক সময়ের অনেক আগেই অকালে জন্ম হয়েছিল সূর্যের।

একাধারে বিজ্ঞানী ও শিল্পী উইলিয়াম হার্টম্যানের কল্পনায় সৌরজগতের জন্মের দশ লক্ষ বছর পরের অবস্থা। কেন্দ্রে সূর্যের জন্ম হয়েছে, তাকে প্রদক্ষিণ করছে ধুলোবালি ও গ্যাস

তাহলে কি আমাদের সৌরজগতের জন্ম কোনও অস্বাভাবিক কারণে হয়েছে? তার নিকটবর্তী অঞ্চলে কোনও দুর্ঘটনার ফলে ত্বরান্বিত হয়েছে এর জন্ম? এর গ্রহমণ্ডল, আমাদের এই পৃথিবী—এই সবকিছুর মূলে কি আসলে রয়েছে কোনও

এই ধরনের আত্মারাম-খাঁচাছাড়া বিস্ফোরণকে বিজ্ঞানীরা বলেন, 'সুপারনোভা'—যার ফলে আক্ষরিকভাবেই নক্ষত্রের ভেতরের মহার্ঘ জিনিসপত্র তার মহাকর্ষের বাঁধন-স্বরূপ 'খাঁচা'র বাইরে বেরিয়ে পড়ে। এইসব জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থ।

নক্ষত্রের মৃত্যু? ভাবতে অবাক লাগলেও এই সিদ্ধান্তে আসা ছাড়া বিজ্ঞানীদের আর কোনও উপায় নেই বলেই মনে হয়। অন্তত পিপলিয়া কালানের মতো কয়েকটি উল্কাপিণ্ডের গবেষণার পর।

গত কয়েক বছরে বিজ্ঞানীরা এই ধারণার সপক্ষে আরও প্রমাণ পেয়েছেন। আমরা জানি যে, নক্ষত্রদের আলো তৈরি হয় তাদের কেন্দ্রে, নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায়। যেমন সূর্যের মতো নক্ষত্রের কেন্দ্রে চারটি প্রোটন মিলে একটা হিলিয়াম পরমাণুকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে, এবং এর ফাঁকে কিছুটা ভর শক্তিতে পরিণত হয়ে আলো হয়ে বেরিয়ে আসছে। নক্ষত্রদের কেন্দ্রে এই নিউক্লিয়ার জ্বালানি ফুরিয়ে এলে তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে। সূর্যের মতো নক্ষত্র এরপর ফুলে উঠে এক-একটা দানব নক্ষত্র তৈরি হয়। কিন্তু সূর্যের চেয়ে দশগুণ ভারী নক্ষত্রের জীবনে এইসময় একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে। সে তখন একটা বিশাল বিস্ফোরণে নিজেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে তার ভেতর সঞ্চিত সব পদার্থ মহাকাশে উগরে দেয়। এ রকম আত্মারাম-খাঁচাছাড়া বিস্ফোরণকে বিজ্ঞানীরা বলেন, 'সুপারনোভা'—যার ফলে আক্ষরিকভাবেই নক্ষত্রের ভেতরের মহার্ঘ জিনিসপত্র তার মহাকর্ষের বাঁধন-স্বরূপ 'খাঁচা'র বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

উল্কাপিণ্ডের এই পাতলা স্তরটি থেকে এর উপাদানের ধারণা পাওয়া গেছে

এইসব জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থ। এক প্রজন্মের নক্ষত্র তার কেন্দ্রে এসব পদার্থ তৈরি করে সুপারনোভায় ছড়িয়ে দেয় মহাকাশে। তারপর সেই ভস্ম থেকে তৈরি হয় পরের প্রজন্মের নক্ষত্র। আমাদের হাড়ের ক্যালসিয়াম, রক্তের হিমোগ্লোবিনের লোহা সবই এইভাবে অতীতের কোনও না কোনও নক্ষত্রের ভেতরে তৈরি হয়েছে বহু যুগ ধরে।

এমন একটা মাত্র পরমাণুও প্রমাণ করে দেয় যে, সৌরজগতের জন্মের সময় তার ওপর নিকটবর্তী কোনও নক্ষত্রের ভস্ম বৃষ্টি হয়েছিল। তখন কিছু পরিমাণ ভারী লোহা এসে পড়েছিল আদি-সৌরজগতের গ্যাসীয় মেঘের ওপর।

সুপারনোভায় বাইরে ছিটকে পড়া পদার্থদের মধ্যে একটা বিশেষ তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে, যা প্রকৃতিতে আর অন্য কোনও পরিস্থিতিতে তৈরি হয় না। সেটা হল, একটা বিশেষ ধরনের লোহার পরমাণু—সাধারণ লোহার পরমাণুর মতো ছাপ্পান্নটা পদার্থকণার বদলে এর মধ্যে থাকে ষাটটা কণা। এর নাম দেওয়া যাক 'ভারী লোহা'। (পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত ভারী জলের অণুও আমাদের পরিচিত সাধারণ জলের অণুর থেকে সামান্য ভারী)।

এই জন্য কোথাও ভারী লোহার অস্তিত্ব কাছাকাছি কোনও সুপারনোভার কথা জানান দেয়। শুধু সুপারনোভার খবর নয়, সেটা কখন ঘটেছে তারও একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। কারণ এই তেজস্ক্রিয় ভারী লোহা কিছু সময় পরে তার রূপ বদলায়—১৫ লক্ষ বছরে অর্ধেক পরিমাণ ভারী লোহা বদলে একটা বেখাপ্পা ধরনের নিকেল পরমাণু হয়ে যায়।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা কয়েকটি উল্কাপিণ্ডে এই বেখাপ্পা নিকেল দেখতে পেয়েছেন এবং তার থেকে প্রাচীন ভারী লোহার অস্তিত্ব অনুমান করেছেন। সেই বেড়াল থেকে রুমালের কথা অনুমান করার মতো।

তাঁদের মতে, সৌরজগতের প্রাচীন কঠিন পদার্থের মধ্যে কম হলেও কিছু পরিমাণ ভারী লোহা ছিল। সাধারণ লোহার তুলনায় প্রায় দশ কোটি ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ছিল এই ভারী লোহা। কিন্তু যতই কম হোক না কেন, এমন একটামাত্র পরমাণুও প্রমাণ করে দেয় যে, সৌরজগতের জন্মের সময় তার ওপর নিকটবর্তী কোনও নক্ষত্রের ভস্ম বৃষ্টি হয়েছিল। তখন কিছু পরিমাণ ভারী লোহা এসে পড়েছিল আদি-সৌরজগতের গ্যাসীয় মেঘের ওপর।

শুধু ভারী লোহাই নয়, আমেরিকার কয়েকজন বিজ্ঞানী ভারতে এসে পড়া আর একটা উল্কাপিণ্ডের মধ্যে—যেটা পড়েছিল মধ্যপ্রদেশের সেমারকোনা নামক জায়গায়—খুঁজে পেয়েছেন প্রাচীন ভারী ক্লোরিনের চিহ্ন—যার রূপান্তরের জন্য সময় লাগে মাত্র তিন লক্ষ বছর। এবং এই ভারী ক্লোরিনও সুপারনোভার মতো বিধ্বংসী বিস্ফোরণ ছাড়া প্রকৃতির অন্য কোথাও তৈরি হয় না।

তাহলে এই গবেষণা থেকে কী বোঝা যাচ্ছে? ধরা যাক, কোনও রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে একজন গোয়েন্দা অনুমান করলেন যে, ঘটনার পিছনে কোনও আততায়ীর হাত রয়েছে। তার পর ঘটনার অকুস্থলে খুঁজে পাওয়া গেল কারও ফেলে যাওয়া রক্তাক্ত রুমাল। ঠিক রুমাল না হলেও সেই রুমাল থেকে হয়ে যাওয়া বেড়াল তো বটেই। এই বার এমনটা মনে হওয়া নিশ্চয়ই স্বাভাবিক যে, এই রুমালটা সেই কল্পিত আততায়ীই ফেলে গিয়েছে।

এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা পিপলিয়া কালানের মতো উল্কাপিণ্ডের গবেষণা থেকে প্রথমে অনুমান করলেন যে, সৌরজগতের জন্মের পিছনে রয়েছে নিকটবর্তী কোনও সুপারনোভার প্রভাব। তারপর সেই সুপারনোভা থেকে ছিটকে পড়া ভারী লোহা, ভারী ক্লোরিন ইত্যাদির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল। তাহলে কি এই সুপারনোভার বিস্ফোরণের ধাক্কাতেই এই মেঘ সংকুচিত হতে শুরু করেছিল এবং জন্ম নিয়েছিল আমাদের সৌরজগৎ?

এই ধরনের প্রশ্ন আরও অনেক প্রশ্নকে টেনে নিয়ে আসে। আমাদের সৌরজগতের জন্ম যদি এমন অস্বাভাবিক হয়, তাহলে কি এই সৌরজগৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্? নাকি এটাই প্রকৃতির নিয়ম?

গত দশকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রায় একশো নক্ষত্রের চারিদিকে গ্রহমণ্ডলী খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা অবশ্য এখনও পৃথিবীর মতো কোনও গ্রহ আবিষ্কার করেননি—নতুন আবিষ্কৃত গ্রহমণ্ডলীগুলোতে তাঁরা এখনও পর্যন্ত শুধু বৃহস্পতির মতো বিশাল গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন। পৃথিবীর মতো ছোট গ্রহ খুঁজে পাওয়া রীতিমতো কঠিন। তবে আশা করা যায়, আগামী দশকের মধ্যে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু গ্রহও খুঁজে পাবেন।

ঠিক পৃথিবীর মতো সসাগরা গ্রহ না পেলেও অন্য নক্ষত্রের চারিদিকে গ্রহের আবিষ্কার হয়তো এটা প্রমাণ করে দেয় যে, খুব একটা আহামরি কিছু নয় আমাদের সৌরজগৎ। তাই এমনও হতে পারে যে, সুপারনোভার ধাক্কা খেয়ে নক্ষত্রের এবং তার চারিদিকে গ্রহের জন্ম খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। এমনটাও হতে পারে যে, একটা নক্ষত্রের মৃত্যুর সঙ্গে আর একটা নক্ষত্রের জন্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নদীর যেমন এক তীর ভাঙে তো অন্য তীর গড়ে। এমন করে চক্রের মতো চলতে থাকে প্রকৃতির ভাঙাগড়ার খেলা।

ভবিষ্যতে এই নিয়ে আরও গবেষণাই বলে দেবে এই ধারণা কতটুকু সঠিক।